সংবাদ

তারিখ ... 16/3/85
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 3 ...

কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতিঃ এবার ভেবে দেখার পালা

এ, এন রাশেদা

(গত সংখ্যার পর)

শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়। শিশুর শিক্ষা গ্রহণের শুরু থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সবটাই শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করুণ দুর্দশার কাহিনী প্রতিদিনই প্রকাশিত হচ্ছে। এ ধরনের প্রাইমারী স্কুল গ্রামাঞ্চলে যদিও বা আছে শহরাঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। তাহলে শহরাঞ্চলে আর্থিক সঙ্গতি রহিত শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যাবে কোথায়?--এ ভাবনা শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা আজ অবধি ভেবেছেন বলে মনে হয় না। যদি ভেবেই থাকবেন তাহলে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের আকাশচুম্বি বেতনে এসব কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল কিভাবে? এসব কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে একবারও শিক্ষা দপ্তর কোন জরিপ চালিয়েছেন কি? কোন ক্লাসে কি ধরনের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলছে, কোন জাতীয় ভাবধারায় তাদের দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চলছে? না, এ ধরনের কোন তাগিদ আজ অবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুভব করেননি। এমন কিছু কিছু স্কুলে সিলেবাস তৈরীর নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা চলে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব স্কুল খুব দূরে দূরে অবস্থিত নয়, তবু সিলেবাস তৈরীর ব্যাপারে এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহের সাথেও কোন যোগাযোগ রাখে না। ইচ্ছেমত ইংরেজী বই চাপিয়ে নিজেরাই স্কুলের উচু মান নির্ধারণ করে। এই সিলেবাস তৈরীতে বিভিন্ন স্কুলে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে তা কয়েকটি স্কুলের উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। এ তুলনা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সঙ্গেও করা যেতে পারে। যেমন ধরুন ফাণ্ডামেণ্টাল ইংলিশ বুক ওয়ান-এই বইটি সেণ্ট জোসেফস স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে দেয়া হয় এবং বুক টু চতুর্থ শ্রেণীর জন্য। সেই বই ঢাকা মণ্টেসরী টিউটরিয়ালে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য সিলেবাস তৈরী করা হয়। রেডিএণ্ট ওয়ে ফার্স্ট স্টেপ আনন্দ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে দেয়া হয়, সে বই মণ্টেসরী টিউটরিয়ালে কে, জিতে দেয়া হয়। ১-১০০ পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজীতে কথায় লিখানোর সময়ও বেশীর ভাগ স্কুলে খেয়াল করা হয় না ঐসব বানান করার মত বাংলা বা ইংরেজীর জ্ঞান তাদের হয়েছে কিনা এবং এক সংগে একটি শিশু কতদূর লিখতে পারে ইত্যাদি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইংরেজী শিক্ষা বেশীর ভাগ স্কুলেই দেয়া হয় না। গতানুগতিক ধারাতে ইংরেজী ব্যাকরণ আর ভাষান্তর-এর বোঝা তাদের ওপর চাপানো হয়। স্কুলের পড়াশুনা অনেক স্কুলেই নোট বই এ লিখে দেয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ এসব বেশীর ভাগ স্কুলই শিশুদের শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে রপ্ত না করে তাদের শুধুমাত্র বিদেশী ভাবধারাতে গড়ে তুলতে চায়---আর এখানেই আমাদের চেতনার সংকট। বাঙালীর শাশ্বত ভাবধারা, জাতীয় চেতনা, এক কথায় আমাদের পরিচয়--এখানে কুন্ঠিত হয়ে দাঁড়ায়। সংকট আরও গভীরে। সরকারী কারিকুলামে প্রাইমারী স্তরের সঙ্গে মাধ্যমিক সিলেবাসের যে সামঞ্জস্য তা এইসব কিণ্ডার গার্টেন এবং টিউটরিয়াল স্কুলের সিলেবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তারপরও প্রশ্ন আছে এসব শিশুরা পড়বে কোথায়? প্রয়োজনের তুলনায় মাধ্যমিক স্কুল কোথায়? অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ অবধি এই শিক্ষা সংকট নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বলে মনে হয় না। কিণ্ডারগার্টেন নামধারী এসব ব্যবসায়িক স্কুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু সীমিত আয়ের লোকের সন্তানদের প্রাক প্রাইমারী শিক্ষাদানের প্রতি সরকার দৃকপাত করেননি। সরকারী উদ্যোগে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে না গড়ে পক্ষান্তরে এই বিলাসী ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। যারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন এবং সরকারী কারিকুলাম মানছেন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা না দিয়ে ভর্তি সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

সংবাদ

তারিখ ... 16/3/85
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 3 ...

(2)

আর সেই সব স্কুল পরিচালনায় শিক্ষকরা হিমসিম খাচ্ছেন। এই সব প্রতিকূল অবস্থা এবং কিণ্ডার গার্টেন নামক বাহারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কবল থেকে পরিত্রাণের জন্য দিশেহারা হয়ে 30/40 টি সীটের জন্য হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ভিড় জমাচ্ছে। যে শিশু হাটাই শেখেনি তাকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থার এ এক ভয়াবহ করুণ চিত্র। যে দেশে অশিক্ষিতের হার শতকরা ৮০জন সে দেশে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ। ভাবতেও অবাক লাগে। আর এসবেরই কারণ দেশে স্বাধীন দেশের উপযোগী সুষ্ঠু শিক্ষা নীতি নেই। শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট রচিত হলেও তা আজও হিমাগারে। এ সূত্রে আমরা স্মরণ করছি ১৯৭৪ এর ডঃ খুদা কমিশন রিপোর্টের কথা।

ডঃ কুদরাত এ খুদা কমিশনের রিপোর্টে ইংরেজী ভাষাকে অবজ্ঞা করা হয়নি। ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের বাস্তব পরিবেশে ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অব্যাহত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। যেহেতু জাতীয় ভাষা জাতির চিন্তা ও সংস্কৃতির আধার জাতীয়তাবোধ বিকাশের প্রধান উৎস জাতিগত ঐক্য সাধনের সর্বপ্রধান মাধ্যম এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিস্তার, সংস্কৃতির প্রসার-কাজেই শিক্ষার মাধ্যম হবে সর্বস্তরে মাতৃভাষা। তবে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক হিসাবে ইংরেজী অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা যেন ইংরেজী পত্র-পত্রিকা পড়ে জ্ঞান আহরণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এ পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য অপেক্ষা ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এবং এ ভাষা শিখাতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। ভাষার বিশেষ প্রয়োগ এবং ধ্বনিতত্ত্বের দিকে নজর দিতে হবে এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নততর করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, শহরে ও শিল্পাঞ্চলে বহু মাতা-পিতাকে চাকরি করতে হয়, ফলে সেসব পরিবারের স্নেহবঞ্চিত শিশুদের মাঝে অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এই অবাঞ্ছিত পরিণতির প্রতিরোধকল্পে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে প্রধানত শ্রমজীবী সমাজের প্রয়োজনমত শিশু উদ্যান স্থাপন করা যেতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার সম্পর্কে বলা হয়েছে বিশ্বের বহু উন্নত দেশে শিশুদের মানসিক, সামাজিক ও দৈহিক উন্নতির দায়িত্বভার সেই দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিভাগগুলো যৌথভাবে গ্রহণ করেছে। তাই আমাদের দেশেও প্রাক প্রাথমিক এই বিশেষ দায়িত্ব এই সব দফতর অথবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থার উপর অর্পণ করা যেতে পারে। ঐ কমিশনের রিপোর্টে ১৯৮০ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ ছিল। কিন্তু আজ '৮৫তে এসে আমাদের সন্তানদের পড়তে চাওয়াটাই অবজ্ঞা করা হচ্ছে। তারা ভর্তির জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে কচি মনে শুধু আঘাতই পাচ্ছে। এর পেছনের কারণ শিক্ষাখাতে ক্রমাগত ব্যয় হ্রাস এবং জাতীয় আয়ের মাত্র ১.২ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়। এসব কারণেই গড়ে উঠেছে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা আপামর মানুষের কাছে না যেয়ে মুষ্টিমেয়ের শোষণ ও শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। ধ্বংস করছে জাতীয় চেতনা, সংস্কৃতি ও ভাবধারা।